ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

রশীদ করীমের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ: মধ্যবিত্তের ভূমিকা

*মো. ইদ্রিস মিয়া

সার-সংক্ষেপ: রশীদ করীম ছোটগল্প দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও বাংলা উপন্যাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর বেড়ে ওঠা কলকাতা শহরে। দেশভাগের পর ঢাকায়। তিনি ব্রিটিশ-ভারত যুগ, পাকিস্তান যুগ ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর জীবনকালে সংঘটিত হয়েছে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নানা অস্থিরতা, অসঙ্গতি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন। এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশেও। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় হয় ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত এবং দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হয় লক্ষ লক্ষ পরিবার। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা অর্জন, দুর্ভিক্ষ, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা প্রভৃতি ঘটনা রশীদ করীম প্রত্যক্ষ করেন। অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ রশীদ করীমের ব্যক্তিমানস বৃহত্তর সমাজজীবন ও সামষ্টিক চিন্তা-চেতনার প্রভাব লক্ষ করা যায়। সমাজে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের বসবাস। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের তুলনায় মধ্যবিত্তের সংকট বহুমুখি। মুক্তিযুদ্ধে মধ্যত্তের ভূমিকা তাঁর উপন্যাসে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ। আমাদের সাহিত্যের উৎকর্ষে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য, সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। এর ফলে আমাদের সাহিত্যে নতুন ভাব-ধারার সংযোজন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানুষের সংগ্রামশীলতা, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, ধৈর্য, শৌর্য বীর্যের কাহিনি লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে থাকে। বাংলা সৃজনশীল সাহিত্যের বিকাশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে অসংখ্য উপন্যাস সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে। বর্তমান প্রজন্মের লেখকেরাও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস লিখে এ ধারাকে সমৃদ্ধ করছে। প্রবীণ আর নবীন লেখকেরা মুক্তিযুদ্ধকে তাঁদের উপন্যাসে স্থান দিয়েছে। কারণ যে চারটি ঐতিহ্যের স্তম্ভের ওপর বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে তার একটি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।[১]

আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বিকাশ সহজতর হয়। উপন্যাস হয়ে ওঠে প্রবহমান সময় ও সমাজজীবনের রূপকল্প। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার ও প্রসার, গদ্যের প্রচার, সংবাদপত্রের দ্রুত বিস্তার, মানুষের পরিশ্রম মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণে সহায়ক হয়। উপন্যাসের সঙ্গে আধুনিক নগর ও নগরে বসবাসকারী মধ্যবিত্তের সম্পর্ক নিবিড়। সময়ের ব্যবধানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধ্যাত্মবাদের জায়গা দখল করে নেয় মানবতাবাদ। উপন্যাসের মাধ্যমে মানবতাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশের ফলে তার অভিব্যক্তি

---

* এমফিল গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রকাশের জন্য যথার্থ শিল্পমাধ্যম খুঁজে নেয়। উপন্যাস এমনই একটি মাধ্যম। জীবনের বহু রূপ। আর বহু রূপের একটি অংশ হচ্ছে, মধ্যবর্গ জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যা আধুনিক মানুষের প্রায় স্বধর্ম হয়ে উঠেছে।[২] উপন্যাসের বাহন হচ্ছে গদ্য। আর এই গদ্যের সুসংহত রূপ প্রকাশের জন্য উনিশ শতকের একটি বিশেষ কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে সাহিত্যিকদের।[৩]

'১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সংগঠক ছিল সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি।'[৪] ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফরাসি মধ্যবিত্ত সমাজ বিকশিত হয়। ফলে, ফরাসি মধ্যবিত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসি উপন্যাস বিকশিত হয়ে ওঠে। ম্যারিভো তাঁর নাগরিক মন এবং মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটান *মারিয়ান* নামক উপন্যাসে। লাফাজ এর *জিল ব্লা*, *প্রেভো* এবং *মানোঁ লেসকো* উপন্যাসে বিভিন্নভাবে এসেছে সমকালীন মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) নিজে মধ্যবিত্ত করেন এবং তাঁর বিখ্যাত *কাঁদিদ* উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা তুলে ধরেন। এরপর আরেক ঔপন্যাসিক দিদেরার (১৭১৩-১৭৮৪) *দ্যা এলান* পত্রোপন্যাসে এক উচ্চমধ্যবর্গের কন্যা সন্তানের কাহিনি প্রাধান্য পায়। স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২), বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০) প্রমুখ তাঁদের উপন্যাসেও মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের কথা স্থান পায়। ১৮১৫ সালের পর ফ্রান্সে বুর্জোয়া সমাজ অভিজাততন্ত্রের ওপর একের পর এক আঘাত চলতে থাকে। এ সময় নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা প্রকাশিত হতে থাকে উপন্যাসে। ১৮৩০ সালের পর থেকে ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে । তবে মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ পাঠকের মননগত পরিবর্তন ঘটে মূলত ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।[৫]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের লেখনীর মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। এর পরপরই আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে তখন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা। ঊনবিংশ শতাব্দিতে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইংরেজরা এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত। ইংরেজরা তাদের প্রয়োজনে নির্মাণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেকার যুবকদের শিক্ষিত করে তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ করে দেয়। প্রথম দিকে মুসলমান সন্তানেরা এতে আগ্রহী না হলেও পরবর্তীকালে মুসলমান সন্তানেরাও এগিয়ে আসে। শিক্ষিত হয়ে ওঠে মুসলমানেরা এবং নিজ যোগ্যতা বলে জায়গা করে নেয়। তারা কেরানিসহ বিভিন্ন পদে চাকরিতে ঢুকে পড়ে। পরবর্তীকালে এরাই হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যবিত্ত।[৬]

বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় চিহ্নিত করণের ইতিহাস মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নির্মম ও নৃশংস অত্যাচারের কাহিনি। উনিশশো বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসন বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের মতো শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের গণজাগরণ ও বৈপ্লবিক চেতনা আমাদের সাহিত্যকে আলোকিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য-মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য। সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিফলন দৃশ্যমান। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, আমাদের সাহিত্যের জগৎটাও পরিবর্তিত হয়েছে।[৭] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সব উপন্যাস শিল্পোত্তীর্ণ না হলেও কোনো কোনো উপন্যাস অনুপম শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *জাহান্নাম হইতে বিদায়* (১৯৭১), *নেকড়ে অরণ্য* (১৯৭৩), *দুই সৈনিক* (১৯৭৩) এবং *জলাঙ্গী* (১৯৭৬), শহীদ আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩), আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৮) *দেয়াল* (১৯৮৬), মির্জা আবদুল হাইয়ের (১৯১৯-১৯৮৪) *ফিরে চলা* (১৯৮১), শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) *অদ্ভুত আঁধার এক* (১৯৮৫), সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) *নীল দংশন* (১৯৮১), *নিষিদ্ধ লোবান* (১৯৮১), *দ্বিতীয় দিনের কাহিনী* (১৯৮৪), *অন্তর্গত* (১৯৮৪) ও *এক যুবকের ছায়াপথ* (১৯৮৭), রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-২০২১) *মেঘের পরে মেঘ*, *হানিফের ঘোড়া*, *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪) ও *ঘাতক রাত্রি* (১৯৯৯), শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) *যাত্রা* (১৯৭৬), আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) *উপমহাদেশ* (১৯৯৪), রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯-২০১৯) *রক্তের অক্ষরে* (১৯৭৮), মাহমুদুল হকের (১৯৪০-২০০৮) *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), রশীদ হায়দারের (১৯৪১-২০২০) *খাঁচায় (১৯৭৫)*, *অন্ধ কথামালা* (১৯৮১) ও *নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য* (১৯৮২), আমজাদ হোসেনের (১৯৪২-২০১৮) *অবেলায় অসময়* (১৯৭৫) এবং *উত্তরকাল* (২০০৮), মাহবুব তালুকদারের (১৯৪২-২০২২) *অবতার* (১৯৭৩), সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) ও *যুদ্ধ* (২০০৫), আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা* (১৯৯৬), আহমদ ছফার (১৯৪৩-২০০১) *ওঙ্কার* (১৯৭৫) ও *অলাতচক্র* (১৯৯০), আবু বকর সিদ্দিকের (জ. ১৯৩৪) *একাত্তরের হৃদয়ভস্ম* (১৯৭১), হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৩), *নির্বাসন* (১৯৮৩), *সৌরভ* (১৯৮৪), *১৯৭১* (১৯৮৬), *আগুনের পরশমনি* (১৯৮৮), *অনিল বাগচীর একদিন* (১৯৯২) ও *জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প* (২০০৬), মুহম্মদ জাফর ইকবালের (জ. ১৯৫২) *আমার বন্ধু রাশেদ* (১৯৯৪), ইমদাদুল হক মিলনের (জ. ১৯৫৫) *মহাযুদ্ধ*, *ঘেরাও*, *নিরাপত্তা হই*, *বালকের অভিযান* ও *কালোঘোড়া* (১৯৮৮), মঈনুল আহসান সাবেরের (জ. ১৯৫৮) *পাথর সময়* (১৯৮৯) ও *সতের বছর পর* (১৯৯১), শাহীন আখতারের (জ. ১৯৬২) *তালাশ* (২০০৫), মহীবুল আজিজের (জ. ১৯৬২) *বাড়ব* (২০১৪) ও *যোদ্ধাজোড়* (২০১৪), আনিসুল হকের (জ. ১৯৬৫) *মা* (২০০২) প্রভৃতি উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নর-নারীর নানামুখী ভূমিকার কথা। কোনো উপন্যাসে উঠে এসেছে আবহমান বাঙালির আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, ধৈর্য, বীরত্ব, সাহসিকতা, জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির মনোবল কত দৃঢ় ছিল তা কোনো কোনো উপন্যাসে উঠে এসেছে। কোথাও এদেশের দোসরদের সহযোগিতায় নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র। কোনো উপন্যাসে নারীর মাতৃত্ব উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর তাগিদ, কোনো উপন্যাসে আমরা পাই স্ত্রী হয়েও রাজাকার স্বামীর অগোচরে মুক্তিযোদ্ধাকে সহায়তা করার চিত্র, কোনো উপন্যাসে পাই নারী নিজের গলার হারটি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেওয়ার চিত্র, কখনো সেবার ব্রত নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাকে সুস্থ করার পথে নারী নিজেকে যুক্ত করেছে, কখনও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে পাক-সেনাকে হত্যা করেছে। কখনো দেশের মুক্তির জন্য নিজের সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে অংশীদার হতে পাঠিয়েছে। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সেবা দিয়ে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বৃহৎ স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। অনেক সময় বুকে তাজা গ্রেনেড বেঁধে শত্রুসেনার গাড়ি বহরে ঝাঁপিয়ে নিজের জীবনের

বিনিময়ে দেশের শত্রু খতম করেছে। কোনো কোনো উপন্যাসে রাজাকার-আলবদর-আলশামসের সহযোগিতায় কিভাবে পাকিস্তানিবাহিনী এদেশে হত্যা,ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও, জুলুম, নির্যাতনের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে তার বিবরণ।

রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১) বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাস নির্মাণকলার অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী। তিনি উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধকে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন মধ্যবিত্তের অবস্থান। তাঁর সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমান বলেছেন, 'রশীদ করীম আমার বিরল বন্ধুদের একজন। আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম তিনি।'[৮] আধুনিক বাংলা সাহিত্য, যে-সাহিত্য শিক্ষিত মধ্যবর্গ বাঙালি সৃষ্টি করেছে, তার নিজের প্রয়োজনে ও আগ্রহে। এই শ্রেণির সঙ্গে এই সাহিত্যের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড়। রশীদ করীম ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তিন পর্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সমাজে তিন শ্রেণির মানুষের মধ্যে মধ্যবিত্তের জীবনে নানা আকাঙ্ক্ষা থাকে, থাকে স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে সংকট, সাহিত্যে যার প্রতিফলন ঘটে। মধ্যবিত্তের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও এই সাহিত্যে আছে। রশীদ করীম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাসগুলোতে মধ্যবর্গকে কিভাবে স্থান দিয়েছেন এবং তাদের ভূমিকা কেমন ছিল; তা তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক *আমার যত গ্লানি* (১৯৭৩), *মায়ের কাছে যাচ্ছি* (১৯৮৯) ও *চিনি না* (১৯৯০) উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রশীদ করীমের জন্ম পরাধীন বাংলায়। ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশ এই তিন পর্বের দীর্ঘ সময়ে সংগঠিত হয়েছে বহু রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও সংস্কার। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠা, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলি, ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিক উদ্‌যাপন, ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারি, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিক উদ্‌যাপনে নিষেধাজ্ঞা, ১৯৬৪ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে নিষিদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসকের বিদায়, ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা প্রভৃতি ঘটনায় বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থান ও ভূমিকা বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকালীন মধ্যবর্গের ভূমিকা রশীদ করীমের উপন্যাসে লক্ষ করা যায়।

রশীদ করীম ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছরে মোট ১২টি উপন্যাস রচনা করেন। ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার উপলব্ধিগুলো তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়ে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন মধ্যবিত্তের ভূমিকা নির্ণয় করা সম্ভব।

আমার যত গ্লানি (১৯৭৩)

আমার যত গ্লানি উপন্যাসটির বিষয় ও পটভূমি ১৯৬৯-৭০ কালপর্ব ও মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ উপন্যাস কথকের আত্মজবানিতে শুরু। *আমার যত গ্লানি*-তে একজন ইতিহাস-সচেতন রশীদ

করীম। আর এই সচেতনা বা অভিজ্ঞতার জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয়েছে দশ বছর। 'তাঁর তৃতীয় উপন্যাস *আমার যত গ্লানি* প্রকাশিত হওয়ার পরই একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, তিনি আমাদের প্রধান কথাশিল্পীদের একজন।'[৯] উপন্যাসে সাতাশটি পরিচ্ছেদে কথক এরফান চৌধুরীর আত্মপ্রসঙ্গ, আত্মখনন, আত্মউন্মোচন ধরা পড়ে। এতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকার রাজপথে মিলিটারির তাণ্ডব, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়।[১০] 'মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বিধান্বিত ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় আত্মস্বরূপের উন্মোচন ঘটেছে রশীদ করীমের *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসে।'[১১]

উপন্যাসে এরফান চৌধুরী উচ্চমধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। একটি এক্সিকিউটিভ কোম্পানির পূর্ব বাংলার প্রধান হিসেবে চাকরিরত। ধনিক, উচ্চবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে স্বাধীনতার তাৎপর্য অর্থহীন; সামাজিক পটপরিবর্তনে তারা খানিকটা ভীত এবং সংশয়াচ্ছন্নই থাকে। *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসে এরফান চৌধুরীর সামনে প্রতিদিনের রাজনৈতিক টালমাটাল দিনগুলোর ছবি ভেসে ওঠে। এরফান কোন দিকে অবস্থান নেবে? মধ্যবর্গের সুখবিলাসী জীবন বেছে নিবে না—কি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজেকে সঁপে দিবে। দু'জন নারী তার মনে আয়েশা ভাবী ও কোহিনূর। কিন্তু কোনো নারীই তাকে ধরা দেয়নি। অন্যদিকে আক্কাস আলী এরফানের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়, সে ভিরু নয়। ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে রাস্তায় যখন মিছিল হচ্ছে তখন এরফানের মনে আনন্দ, দেশের মুক্তি চায়। কিন্তু নারী, মদ আর বিলাসীজীবন নিয়ে সে মত্ত থাকে। নবী বখশের সঙ্গে কথা বলার সময় তার বেশ সন্দেহ হয়। কারণ মধ্যবিত্তের সন্দেহপ্রবণতা এরফান চরিত্রে স্পষ্ট। ঊনসত্তর-সত্তরের টালমাটাল অবস্থায় নবী বখশকেও সে বিশ্বাস করে না। তখন বাংলাদেশের ক্রান্তিকাল। উনসত্তর-সত্তরের ঘূর্ণিতে এরফানের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে পড়ে।[১২] জমিন নামক চরিত্রটি এরফান চৌধুরীকে স্বাধীনতার পক্ষে মিছিল মিটিংয়ে আহবান জানালেও মধ্যবিত্তের দ্বিধান্বিত মানসিকতা আর আত্মরতি তাকে পিছু টানে। সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তের পরিচয় বহন করে এরফান চৌধুরী।

এরফান চৌধুরী পুরো উপন্যাসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করে নেয়। মধ্যবিত্তের এই চরিত্র কখনও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে চায়, পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার পেছনে ফিরে আসে। উনসত্তর আর সত্তরের উত্তাল সময়ে মিটিং মিছিলে দেশ উত্তাল। সে সময় এরফানকে দেখা যায় অন্য অবস্থায়—'মিটিং-ফিটিংয়ে আমি যাই-টাই না। দম বন্ধ হয়ে আসে, লোকজন দেখলেই। কিন্তু সেদিন যেতে হয়েছিল। নইলে, ব্যাটা আবার বলে বেড়াতে পারে, কনভেনশন লীগার।'[১৩] দ্বৈত নীতি অবলম্বন করে সুবিধা নেওয়াই তার লক্ষ্য।

আবেদ উপন্যাসের মধ্যবর্গ চরিত্র। অক্সফোর্ড-হাভার্ডে লেখাপড়া শিখেছে। এখন দেশের বাইরে থাকে। আবেদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। সে ১৯৪৮ সালে কার্জন হলের সামনে ভাষার দাবিতে মিটিংয়ের প্রধান বক্তা। কারণ,বাংলা ভাষা ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার যুব সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে।[১৪] ভাষার দাবি এরফান ভুলে গেলেও ছাত্র সমাজ এই দাবি ভোলেনি। আবেদ এরফানকে ভাষার দাবিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু এরফান একুল-ওকুল ভেবে পিছপা হয়। বরং আবেদের সঙ্গে বেশি মেশার পরিণতি ভালো হবেনা সেটি গুরুত্ব পায়। 'তোমার সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে যে আমার হাতেও দড়ি পড়বে।'[১৫]

এরফান রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট করে সরাসরি মতামত দেয় না কিন্তু এসব ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ে এগিয়ে যায়।[১৬] সে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এগিয়ে গেলেও ভাষা আন্দোলনসহ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের কোনটিতে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধেও সক্রিয় হতে দেখা যায় না।

আব্বাস এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। সে একটি কলেজের শিক্ষক। মধ্যবিত্তের চরিত্র। সে প্রান্ত থেকেও আন্দোলনকে সক্রিয় রাখতে পারে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন হচ্ছে তখন এরফানকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এরফানের ভয়কে জয় করানোর চেষ্টায় আব্বাস ত্রুটি করেনি। এই ডাকে চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া জমিনও তাতে সাড়া দেয়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিতে জমিন সরু কঞ্চি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এমন দৃশ্য দেখে এরফান অনুশোচনায় দগ্ধ হয়; তবুও সক্রিয় হতে দেখা যায় না।

> সত্যি, মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি একটা শুয়োরের বাচ্চা। মাঝে মাঝে আবার একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। খানিকক্ষণ পারিও, অন্যরকম হয়ে থাকতে। আবার কী যে হয়, নিজের খসলতেই ফিরে আসি। ভয়-কেবলি ভয়। রক্তকে আমার বড্ড ভয়। আচ্ছা, এতো লোক, দুধের বাচ্চাও, বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে–আমি পারি না কেন? ভয় কেবল আমারই। আমার মন যা চায়, আমার আচরণে, তার প্রকাশ থাকে না কেন?[১৭]

এই ভয়কে অতিক্রম করতে পারেনা বলে; না পারে চাকরিতে মনোযোগ দিতে, না পারে কোহিনূর ভাবী বা আয়েশাকে জয় করতে; না পারে বাংলাদেশের উত্তাল সময়ে দেশের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে। মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানবিরোধী জনরোষ, প্রতিবাদের আগুন, শেখ মুজিব-ইয়াহিয়ার দ্বন্দ্ব, ফৌজিবাহিনীর নিপীড়ন তাকে নাড়া দেয় কিন্তু তার জীবন পড়ে থাকে ক্লাব-পার্টি-নারী-মদে।[১৮] আবার এই ধরণের চরিত্র রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখে রাজনীতির সুবিধা নিতে বেশ সিদ্ধহস্ত। 'রশীদ করীমের নায়কেরা কেউ রাজনীতিমনষ্ক নন। রাজনীতি সচেতন হলেও ব্যক্তিবাদী।'[১৯]

আকরম এরফানের কলেজ বন্ধু। সে রাজনৈতিক কর্মী। দু'বছর জেল খেটে বের হয়। আকরম পরিচয় দিয়ে ফোন করলে রাজনৈতিক ঝামেলা এড়াতে এরফান সতর্কতা অবলম্বন করে। রাস্তায় এক্সিডেন্ট করে লোকটি পড়ে থাকলেও পুলিশের জবাবদিহিতার জন্য সাহায্যে এগিয়ে আসে না। লোকটিকে সহযোগিতা করার চেয়ে ক্লাবে আয়েশার সঙ্গে দেখা করা তার চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরফান মুসলিম-হিন্দু দাঙ্গার সময় রবীন্দ্র রচনাবলি পুড়িয়ে ফেলে। সে সুযোগ বুঝে পায়জামা-পাঞ্জাবির পরিবর্তে শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে।

উপন্যাসের শেষের দিকে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হন। বঙ্গবন্ধুকে প্রেসিডেন্ট হাউজে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন টালবাহানা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে পঁচিশে মার্চের রাতে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্বিচারে গুলি, জ্বালাও, হত্যা, লুণ্ঠতরাজের মেতে ওঠে। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কেঁপে ওঠে সমগ্র দেশ। পাকবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় রেকর্ডার বাজাচ্ছে- 'বাড়ি থেকে জয়-বাংলা ফ্ল্যাগ এক্ষুণি নাবিয়ে ফেলুন। যে বাড়িতে জয়-বাংলা ফ্ল্যাগ দেখা যাবে, সেই বাড়িতেই বোমা ফেলা হবে। আর জয়-বাংলা বলা চলবে না। যে বলবে জয়-বাংলা তাকেই গুলি করা হবে।'[২০] সেই রাতে ট্রাকে ট্রাকে মানুষের লাশ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে লাল তরতাজা রক্ত। জয় বাংলা ফ্ল্যাগ যেই বাড়িতে সেখানে বোমা ফেলা হয়। রাতব্যাপী এমন নারকীয়কাণ্ড চালায় পাকবাহিনী—

> 'পঁচিশ তারিখের রাতে ট্রাক-ভর্তি মরা মানুষ দেখা গেছে। একটা-দুটো নয়। ডজন ডজন ট্রাক। একটা-দুটো মরা মানুষ নয়, শত শত। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। সকলে আবার মরেও নি। পাশে,ওপরে, নিচে মরা লাশ; সেই অনড় স্তূপের ফাঁক দিয়ে, হঠাৎ একটা হাত একবার নড়ে ওঠে। কখনো একটা পা। প্রাণটা এখনো যায়নি তাহলে। নাঃ, এরা এফিসিয়েন্ট। অনেক কিছুই সরিয়ে ফেলেছে। পঁচিশ তারিখে সারা রাত, ছাব্বিশ তারিখ সারাটা দিন; মেরেছে, কেবল মেরেছে। মেরেছে আর লাশ সরিয়ে ফেলেছে।'[২১]

শাহীন আখতারের *তালাশ* উপন্যাসের বর্ণনার সঙ্গে যেন মিলে যায়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ 'অপারেশন সার্চলাইট' রাতে বাঙালিদের ওপর নেমে আসে অন্ধকার। হত্যা, নির্যাতন, আগুন রাতব্যাপী। জগন্নাথ হলের ২৯ নং কক্ষে একসঙ্গে তিনজন ছাত্রকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয়। হলের ছাদে একসঙ্গে পঁচিশজনকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে পাকবাহিনী। "টিক্কা খানই 'অপারেশন ব্লিৎস'-কে পরিবর্তন করে আরও ভয়ানক রূপ দিতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামকরণ করেন।"[২২] সে রাতে মরিয়ম ওরফে মেরিতে রূপান্তর ঘটে।

> ২৫ মার্চের রাতে ঢুকে পড়েছে মুক্তি। তা অন্ধকার বেহুলার নিশ্ছিদ্র বাসর যেন,মনসার প্রতিশোধের উষ্ণ নিঃশ্বাসে যার মোম-বন্ধ ফুটোটা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। সেরকম এক সুচ-ছিদ্র পথ দিয়ে কথা বলতে বলতে দুজন অসমবয়সি নারী সেই কালো রাতে প্রবেশ করে। বয়স ছাড়াও তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। দৃষ্টিভঙ্গিতেও ফারাক বিস্তর। মরিয়ম তখন ছিল খাটের তলায় চেতনাহীন। কয়েকটা বোমার শব্দ ছাড়া সেই রাতের কোনো স্মৃতি নেই।[২৩]

ঔপন্যাসিক এই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মানুষের লাশের অসহ্য দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুর্গন্ধকে লেখকের সুগন্ধ মনে হয়। কারণ তিনি দেখতে পেয়েছেন বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ, ফুলের খুশবু, পাকা ফল, মাঠে নতুন ফসল। আরো দেখা যাচ্ছে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই, কেবলি আনন্দ আর আনন্দ।

মুক্তিযুদ্ধে মধ্যবিত্তের ভূমিকা সবার আগে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে শিক্ষিত মধ্যবর্গের যে দ্বিধান্বিত টানাপোড়েন সেই সত্যকে অকপটে মেলে ধরেন রশীদ করীম।[২৪] সেই রাতে যা ঘটে তাতে এরফান চৌধুরীর কিছুই যায় আসেনা। 'মধ্যবিত্তের একটি অংশ এমনিভাবে সংকট থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলো; কিন্তু যুদ্ধের সময়ে দেশের সমগ্র মানুষ, যাদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণির অনেক মানুষ ছিলো, নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়নি, উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলো- এটাও সত্য এবং প্রকৃত সত্য।. . . রশীদ করীমের *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসে এরফান মিয়া রয়েছে কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু সে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় টগবগিয়ে উঠতে পারেনি।'[২৫] সত্যনিষ্ঠ বিচারে ব্যক্তিমানস ভয়ে নিজেই নিজের কাছে আত্মসমর্পণ করে, সংকুচিত হয়ে শামুকের মতো নিজের খোলসের মধ্যে গুটিয়ে নেয়।[২৬]

মধ্যবর্গের এরফান চৌধুরীর মহান মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারেনি। তবে তার মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হতে দেখা যায়। এরফান চৌধুরী লন্ডনে একটি ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পায়। ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার পথে একটি ছোট মেয়েকে রাস্তার ধারে কাঁদতে দেখতে পায়। খবর নিয়ে জানা যায়, সে তার বাবা-মাকে হারিয়ে ফেলেছে। এরফান প্রথমে বিষয়টিকে কানে না নিয়ে লোভনীয় চাকরি হারাতে চায় না বলে ছুটে চলে। কিন্তু অফিসের কাছাকাছি গিয়ে

মেয়েটির কথা মনে হয়। সে ভাইভাতে অংশগ্রহণ না করে ফিরে আসে মেয়েটিকে বাবা-মায়ের নিকট পৌঁছে দিতে। 'কোনো মানুষই সামাজিক মানদণ্ডে একশ ভাগ খাঁটি কিংবা শুদ্ধ নয়। ভালো-মন্দে মিলিয়েই মানুষ। রশীদ করীম তাঁর *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসটিতে এই চরম সত্যটিই উচ্চারণ করতে চেয়েছেন।'[২৭] তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মনির্মোচনের বিনির্মাণ।[২৮]

ইতিহাস আর রাজনীতি উন্মোচন করতে গিয়ে *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসে উনসত্তর-সত্তর, মুক্তিযুদ্ধ, সংগ্রাম, সার্বিক অধিকার আদায়ের মধ্যবর্গের আত্মরতি, আত্মাধিকার, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ভাবালুতা, কৌতুকপ্রবণতা, বাস্তবের নানা সূক্ষ্ম অভিমুখ, নানা পরস্পরবিরোধী স্রোতগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে মধ্যবর্গের দ্বিধান্বিত মানসিকতা, সংশয়, দোদুল্যমানতার পাশাপাশি ত্যাগ, সাহসিকতা, বীরত্ব চরিত্রগুলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

মায়ের কাছে যাচ্ছি (১৯৮৯)

রশীদ করীমের *মায়ের কাছে যাচ্ছি* উপন্যাসেও মধ্যবিত্তের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, ঈর্ষা, যৌন সমস্যা, পারিবারিক সংঘাত, মুক্তিযুদ্ধে চরিত্রগুলোর ভূমিকা বিষয়গুলোকে নিরাসক্তভাবে লেখক মেলে ধরেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে হঠকারিতা, ছল-চাতুরি, নীতিহীন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া, পাকবাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করা, স্বার্থপরতা, ধর্ষণ, হত্যা, লুটতরাজ, নারকীয়তা প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে উপন্যাসে। একই সমাজে পাশাপাশি বসবাস করে সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন। এমন পরিস্থিতিতে তাদের আসল চরিত্র উন্মোচিত হয়। 'শিল্পীচৈতন্য সমাজ-চেতনা প্রবাহেরই অগ্রসর অংশ। শিল্পী তাঁর অঙ্কিত চরিত্র পাত্রের মাধ্যমে সেই সমাজ-চৈতন্যকেই অভিব্যঞ্জনা দান করে।'[২৯] *মায়ের কাছে যাচ্ছি* উপন্যাসে তাই উপজীব্য।

উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্র কামর। মধ্যবিত্তের চরিত্র। তার বাবা সাব-রেজিস্ট্রার। কামরের কথাতেই মুক্তিযুদ্ধকালীন কার কী অবস্থা বা ভূমিকা ছিল তা ধরা পড়ে। কামর নিজে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও বিভিন্নভাবে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেওয়া ছিল ভয়াবহ অপরাধ। মুক্তিপাগল মানুষ নানাভাবে মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কামরের পরিবার নিজেদের সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করেও মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেন। 'কিন্তু কামর কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাকে ঘরে জায়গা দেওয়া এক অন্য বিপদ ছিল।'[৩০]

কামরের বন্ধু শওকতকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্তকভাবে পথ চলতে দেখা যায়। কোন দিকে অবস্থান নিলে আখেরে ভালো হবে তাই তার ভাবনা। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত এমন একটা ভাব নেয়। পরক্ষণে একুল-ওকুল ভেবে পেছনে ফিরে আসে। মধ্যবিত্তের দ্বিধান্বিত মানসিকতা কাজ করে তার ভেতর।

> সেভেনটি-ওয়ানে তিনি বিদেশে পাকিস্তানের এক এমব্যাসিতে ছিলেন। আরো অনেক বাঙালি ছিলেন। শওকত চুপচাপ ঘটনা প্রবাহ দেখছেন। অন্তরঙ্গ বাঙালি কলিগদেরও কোনো ব্যাপারেই 'ইয়েস' বা 'নো' বলছেন না। প্রশ্নের শরীর থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়ার এক আশ্চর্য কৌশল তিনি রপ্ত করেছিলেন। দেখাই যাক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। তারপর অবস্থা

> দেখে ব্যবস্থা। পুরো ন'টা মাস কেটে গেল। 'ডিফেক্ট' করলেন না। একটি মাত্র মেয়ে তাঁর। সঙ্গেই আছে। বাংলাদেশ যে হবে, সেটিই তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি।[৩১]

শওকতের মতো অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলেও স্বাধীনতার সুবিধা নিতে সামান্য দ্বিধা করেনি। বরং ঢাকায় ফিরে কামরের সঙ্গে বেশি করে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া করে সম্পর্কের মাত্রাটি আগের পর্যায়ে নিতে চেষ্টা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার এই ভূমিকাকে 'দূরদৃষ্টির পরিচয়' বলেও অভিহিত করতে লজ্জা পায়নি।

খোলস পাল্টানো শওকতের পাশাপাশি তৈয়বা নামের এক নারীকেও মধ্যবিত্তের দ্বিধান্বিত মানসিকতা পোষণ করতে দেখা যায়। সারা দেশে বিক্ষোভ, আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায়। স্বাধীনতা যেন হাতের নাগালে। পরিস্থিতি অনুকূলে মনে করে এই নারী বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মুখস্থ করে একটি নারী মহিলাদলের নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ যেতে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। তৈয়বা হাঁটছে আর মুখস্থ বক্তৃতা অনবরত মুখ হতে বের হচ্ছে—

> ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া এলেন।. . . এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। ... আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।... সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৩২]

কিন্তু ২৫শে মার্চের রাতে তৈয়বাকে পাওয়া যায় অন্য রূপে। বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা আশার সম্ভাবনা যখন ক্ষীণ তখনই তার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুখে আগুনের মত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বরফ হয়ে যায়। শেখ মুজিবের ছবির পরিবর্তে দেয়ালে টাঙানো হয় জিন্নাহ আর ইয়াহিয়ার ছবি। মধ্যবিত্তের এই নারী মুক্তিযুদ্ধের সময় মগবাজারে এক বিহারির বাড়ি অতি অল্পমূল্যে কিনে নেয়। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কিছু পুরুষের পাশাপাশি ধূর্ত নারী তৈয়বাও বেশ সুযোগসন্ধানী।

মায়ের কাছে যাচ্ছি উপন্যাসে পাকবাহিনির নির্মম নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায়। কামর সাহেবেদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানি এক অফিসার মুক্তিবাহিনীকে খোঁজে। কিন্তু সে অভিযানে মুক্তিবাহিনী না পেলেও বই আর মদ উদ্ধার করে। তারা মনে করে বই হচ্ছে অস্ত্রের চেয়ে বিপজ্জনক। বাড়িতে বিশ-বাইশ বছরের ছেলে থাকা ভয়ংকর তাই সন্দেহবশত পাশের বাড়ির দুটি ছেলেকে তুলে নিয়ে যায়।

> কামর গেটের সামনে এগিয়ে এলেন। অফিসার জিপে গিয়ে উঠলেন। জিপ প্রেমালাপের মতো মৃদু মোহন বোল তুলে স্টার্ট নিলো। গেটে দাঁড়িয়ে থেকে কামর বললেন, খোদা হাফেজ। অফিসার একবার ফিরে তাকালেন। একবার এ কথাও তার মনে হলো, লোকটা আমাকে বেকুব বানাচ্ছে না তো? কিন্তু গাড়িতে উঠে পড়লেন। লোকটার মনে যাই থাক, তাকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কোনো কাজ হবে না, কামর সাহেবকে মনে মনে এই সার্টিফিকেট দিয়ে অফিসার চলে গেলেন। অবশ্য চলে যাওয়ার আগে, পাশের বাড়ি থেকে দুটি ছেলেকে তুলে নিলেন গাড়িতে। তাদের আর কেউ কোনোদিন দেখেনি। তারা মুক্তিযুদ্ধে ছিল কিনা কেউ জানে না। কিন্তু বয়স বিশ-বাইশ। তাই-ই যথেষ্ট।[৩৩]

এই ঘটনার পর তাদের খবর পাওয়া যায়নি। উপন্যাসে কামরের বড় ভাই তওফিক সাহেবের মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্ধান পাওয়া যায়নি। তওফিক ভাই ইংরেজিতে বি.এ পাস করে খাদ্য দফতরে একটি অস্থায়ী পদে চাকরি করতো। অভিমান করে তওফিক ভাই প্রথমে পরিবার থেকে পরে মানসিক হাসপাতাল ভর্তি হয়েছিল। এই তওফিক ভাই আসলে রশীদ করীমের বড় ভাই, যিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। উপন্যাসে এই চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের জীবন থেকে নেয়া। অপ্রকৃতিস্থ বড় ভাই মানসিক পীড়ায় ভুগে পাবনায় মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৩৪]

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনী বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করতো তার বিবরণ পাওয়া যায় উপন্যাসে। অভিযানের নামে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হত্যা, ধর্ষণ, লুঠতরাজে মেতে উঠতো। নগর, গ্রাম সবখানেই চলতো অগ্নিসংযোগ। এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় তাদের অভিযান অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক হতো। নিজেকে রক্ষার জন্য সৎ মানুষকেও ধরিয়ে দিতে সঙ্কোচ করতো না। পাক অফিসার এলে এদেশের মানুষগুলোর পরিচয় স্পষ্ট হতো। কেউ কেউ জয় বাংলার পরিবর্তে পাকিস্তান জিন্দাবাদ মুখে তুলে নিতো। পাকিস্তানি এক অফিসারের সঙ্গে আলাপচারিতায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> 'ইধার কৈ 'মুক্তি' হ্যয়?'
> তৈয়বা সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কিন্তু অফিসার কর্ণপাত করলেন না।
> কামরকে জিগ্যেস করলেন, ইউ অ্যালোন লিভ আপস্টেয়ার্স?
> 'ইয়েস।'
> 'এনি আর্মস দেয়ার?'
> 'নো। আই হ্যাভ নো ইউজ ফর আর্মস।'. . .
> তৈয়বা আবার বললেন, হামলোগ 'মুক্তি' ন্যাহি হ্যায়। সন্ধ্যাবেলা রাজাকার ভাই লোক আতা। চা পান করতা। কোই কোই মিসক্রিয়েটকো হামলোগ ধরা দিয়া হ্যায়।[৩৫]

কামর, তওফিক ভাই, শওকত, তৈয়বা মুক্তিযুদ্ধে তাদের মিশ্রাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবর্গের লাভ-ক্ষতির হিসেবে তারা নিজেদের অবস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করে নেয়। মধ্যবর্গ এক পা এগোয় তো দুই পা পিছায়; এই সংশয়ই কামর, তৈয়বা, শওকতদের মধ্যে লক্ষণীয়। যারা আক্ষেপ করেছিল মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সার্থক উপন্যাস লেখা হয়নি; তাদের জন্য *আমার যত গ্লানি* এই আক্ষেপ দূর করতে পারে।[৩৬]

চিনি না (১৯৯০)

রশীদ করীমের সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস *চিনি না* । উপন্যাসটি কবি শামসুর রাহমান সম্পাদিত *মূলধারা* পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। একই বছর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ এর কাল পরিধি নিয়ে রচিত হলেও মূলত এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের সময় রুদ্ধশ্বাসময় নয়টি মাসের পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একজন বাঙালি মধ্যবর্গের দ্বন্দ্বাত্মক সংকট, জীবনবাস্তবতা, রাজনৈতিক চেতনা, পারিপার্শ্বিক সচেতনতা, আত্মপচন, আত্মগ্লানি, স্বদেশবোধ, স্বাজাত্যপ্রীতি প্রভৃতি অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে ঔপন্যাসিক *চিনি না*

উপন্যাসে স্থান দেয়।[৩৭] রশীদ করীম রজনীতির সঙ্গে কখনো জড়িত ছিলেন না। তবে তাঁর বহু বইয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতি লক্ষ করা যায়। তাঁর যে কয়টি উপন্যাসে রাজনীতি আছে তাদের মধ্যে *চিনি না* অন্যতম।[৩৮] উপন্যাসের কলেবর ছোট হলেও এর বিষয়বস্তু, গভীর নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে। রশীদ করীম মনে করেন, একটি রচনা উপন্যাস হয় তার স্বভাবের জন্য; কেবলই তার কলেবরের জন্য নয়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুলেমান একটি পাকিস্তানি কোম্পানিতে চাকরি করে। মধ্যবিত্তের চরিত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, গণহত্যা আর জ্বালাও পোড়াও প্রত্যক্ষ করে। এমনকি সে নিজেও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তি কামনা করলেও দেশের জন্য নিজেকে সঁপে দেওয়ার মত সাহস বা ত্যাগ লক্ষ করা যায় না। *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসের এরফানের মতো লোভ, মোহ আর নারীতে আবিষ্ট হয়ে থাকে সুলেমান। যুদ্ধকালীন সহকর্মী বিমলের স্ত্রীর প্রতি তার লোলুপদৃষ্টি আর কাম চরিতার্থ করার অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর প্রতি কুৎসিত কামনা সুলেমানের নৈতিক স্খলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

উপন্যাসের শুরুটি একটি পারিবারিক পরিমণ্ডলে হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর লোমহর্ষক ও বিভীষিকাময় নির্যাতনের চিত্র আর এ দেশীয় কামনা-বাসনায় লিপ্ত সুযোগসন্ধানী মানুষের অভিপ্রায় বেশি ধরা পড়ে। বিভিন্ন অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বাঙালিদের ওপর চড়াও হয় পাকিস্তানি বাহিনী। সুলেমানের অফিসে এক ক্যাপ্টেন মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজখবর নিকে অভিযান চালায়। মধ্যবিত্ত সুলেমানও নিজেকে বাঁচাতে পাকিস্তানিদের প্রশংসায় লিপ্ত হয়ে ওঠে।

> নিজেকে বাঁচাতে হবে। নার্ভাস হলে বিপদ আছে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম. 'দেখুন যা বলবার সবই বলেছি। ছবির কথা বললেন? হ্যাঁ, ওখানে শেখ মুজিবুরের ছবি ছিল। সেই নন-কোঅপারেশনের সময় 'মিসক্রিয়েন্টদের' দাপটে আমরা সকলেই অস্থির ছিলাম। দেশে তখন শান্তি ছিল? আপনারাও হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। শান্তি ফিরে এসেছে এখন। আমরা বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারছি। সেই সময় শেখ মুজিবের ছবি না থাকলে, আমরা জানে বাঁচতাম?'[৩৯]

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথোপকথনে সুলেমান নিজেকে তাদের অনুসারী আর অনুগত হিসেবে পরিচয় দেয়। সে পাকিস্তানি কোম্পানিতে চাকরি করতে গিয়ে যুদ্ধকালীন আতঙ্ক আর উত্তেজনার মধ্যে দিনগুলো অতিবাহিত করে। জীবনকে বাজি রেখে কখনো ঢাকায় কখনো করাচিতে দুর্বিষহ সময় অতিক্রান্ত করে। জীবন ও জীবিকার স্বার্থে অনাগ্রহ সত্ত্বেও অফিসে আসা-যাওয়া বন্ধ করেনি।

> এরই মধ্যে আমরা বেঁচে আছি। বেঁচে আছি এবং আংশিক বেঁচে আছি। আমরা বাঙালিরা কোনোমতে এখান-সেখান থেকে পাখির মতন খড়কুটো তুলে এনে কোনোমতে একটা নীড় বেঁধে এখন বেঁচে আছি। খুবই আংশিকভাবে, খণ্ডিত ভাবে বেঁচে আছি।[৪০]

মুক্তিযুদ্ধে সুলেমানের দোলাচলবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় পুরো উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মধ্যবিত্ত সুলেমানের অবস্থান অস্পষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ। সে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সক্রিয় অবস্থান নেবে মনে করলেও বাস্তবে সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারেনি। বাঙালিদের প্রতি মমত্ববোধ লোক দেখানো মাত্র। আন্দোলন সংগ্রাম যখন তুঙ্গে তখন অনেকেই সরকারি-বেসরকারি চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুলেমান পশ্চিম পাকিস্তানের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন গোপন বৈঠকে অংশগ্রহণ করে।

সে বন্ধু বিমলকে অফিসে না আসলেও দীর্ঘদিন উপস্থিত দেখায়। বিমল তখন মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া মন্টুর পরিবারের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন এক মহিলা ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় ভাগ্নে কুদ্দুসকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে বিপদ হতে রক্ষা করে। কার্ফ্যুপাস পাওয়া আজগরকে ঘৃণা করে আবার নিজেকে বাঙালি পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। কার্ফ্যুতে কষ্ট পাওয়া মানুষের জন্য কষ্ট হয়, কিন্তু প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার সাহস তার থাকে না। নিজের অপরাগতাকে অনায়াসে স্বীকার করে নেয়। মধ্যবর্গের সুলেমান বিপরীতমুখী নীতি অবলম্বন করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। 'যদিও আমি কোনো বীর নই। বরং কাপুরুষ। ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর। আমি চিরকালের কাপুরুষ। আজ কিন্তু লড়ে যাব।'[৪১] বাস্তবে *আমার যত গ্লানি* উপন্যাসের এরফানের মতো সুলেমানও লড়তে পারেনি। কারণ মধ্যবিত্ত কেবলই তার পুরানো আশ্রয় আঁকড়ে ধরতে চায়।

সুলেমানের স্ত্রী সুষমা মধ্যবিত্তের নারী। সুষমার ভাই মুক্তিযুদ্ধে। তৈয়বা থেকে সুষমা হওয়ার ইতিহাস বাঙালি জাতিসত্তার শেকড় অনুসন্ধান ও ব্যক্তি-অস্তিত্ব উন্মোচনের ইতিহাস। জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ও ২৮শে মার্চ ১৯৪৮ রেডিওতে ভাষণে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বাঙালিরা রাজপথে নেমে আসে। ১৪৪ ধারা অমান্য করে তৈয়বার বাবা আইনজীবী জাহাঙ্গীর সাহেব রাজপথে অবস্থান নেন। পাকিস্তানি বাহিনী তার ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে তিনি আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে তার নিজের মেয়ের নাম তৈয়বা পরিবর্তন করে রাখেন বাংলা নাম সুষমা। বাংলা নাম রাখার প্রতিবাদটি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে সুলেমানের চেতনা প্রবাহে।[৪২] এই চেতনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৭ সালের রবীন্দ্র বিতর্ক, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, নির্বাচনের পর শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দেওয়ার নামে প্রহসন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিষ্ঠুর কালোরাত, স্বাধীনতার ডাক, মুজিবনগর সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জন পর্যন্ত বিস্তৃত। স্ত্রী সুষমার সঙ্গে সুলেমানের কথোপকথনে রাজনৈতিক সচেতনতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় । 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না।'[৪৩] সত্যিই বাঙালির আত্মত্যাগে দেশ স্বাধীন হয়। তাতে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু সুলেমানের মতো অনেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে স্বাধীনতার সুবিধা নিতে ভুল করেনি। তাই তার সম্পর্কে নিজেই বলেছে-'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি নিজেকেই চিনি না।'[৪৪]

সে আত্মসমর্পণ করে পেটের দায়ে চাকরির কাছে। কিন্তু তার শত ভয়-দ্বিধা-অক্ষমতা-স্নায়ুচাপ সত্ত্বেও বাঙালি জাতিসত্তার প্রশ্নে আপস করেনি।[৪৫] সুলেমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি বলে প্রায়শই বিপরীতমুখী টানে ক্ষত-বিক্ষত হয়। সে চাটুকারিতা, ভ্রষ্টতা, অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা পছন্দ করে না; তবে রতি-কামনায় সুযোগসন্ধানী। তার মনোজগতে আত্মপচন লক্ষ করা যায়। সে যুদ্ধের সময় তারই বন্ধু বিমলের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে।

> আমি শক্ত করে মন্দিরার হাত ধরলাম। বহুদিন থেকে আমি মন্দিরাকে মুঠিতে ধরতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাতাসকে মুঠির মধ্যে ধরবার চেষ্টা করলে হাতে যেটুকু বাতাস ছিল তাও মুঠি থেকে ফস্কে যায়, মন্দিরাও সেইভাবে সরে গেছে!
>
> হাত ছাড়ুন।
>
> আমার কবজা আরো দৃঢ় হলো।

> ছাড়ুন, আমার হাত ছাড়ুন।
> মন্দিরা থরথর করে কাঁপছে। আমার মাথায় মদ চড়েছে। মদ খারাপ জিনিস। কিন্তু সেদিন মদের ঘোরে আমি কিছুই করিনি। অনেক দিন থেকে লোভ জমা হচ্ছিলো। আমি জানি, সেই লোভই আমাকে আজ এখানে টেনে এনেছে। মন্দিরা অসহায়- তারই সুযোগ নিচ্ছি। আমি কি তাহলে যাদের রাজাকার বলি তাদেরই একজন হয়ে গেছি? মন্দিরা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। আমি অসুরের মতো শক্ত হাতে ধরে তাকে মাটিতে চেপে ধরেছি।[৪৬]

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি এদেশের সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্ষণে লিপ্ত হয়। সুলেমান মন্দিরার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অসুরের শক্তি প্রয়োগ করে ধর্ষণ করে। পরবর্তী সময়ে নীতি বিবর্জিত কর্মের জন্য তাকে অনুতপ্ত হতে দেখা যায়। পাপবোধ তাকে তাড়া করে। সে নিজেকে রাজাকার ভাবতে শুরু করে। 'মুক্তিযুদ্ধ অবলোকনের প্রশ্নে আমাদের ঔপন্যাসিকদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আবেগের দ্রুততায় যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবিত্তের জীবনবলয়ে আবর্তিত হয়েছে।'[৪৭]

সুলেমান এই দুরবস্থায় বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার মধ্যে আনন্দ অনুভব করতে না পারলেও তারই অফিসের সহকর্মী বিমল মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে সঁপে দেয়। বিমলের নিকট চাকরি বড় মনে হয়নি বরং দেশমাতৃকার জন্য স্ত্রী, চাকরি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। আরেক সহকর্মী মন্টু অফিসের ডুবলিকোটিং মেশিনটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উপন্যাসে পাকিস্তানি বাহিনীর নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে নারীদের তুলে নিয়ে ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতন করতে দেখা যায়। পানঅলা তার মেয়েকে সুলেমানের কাছে রাখতে চাইলে বিপদ এড়াতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তী সময়ে অধিক অনুরোধে তার কাছে রাখতে সম্মতি দিলেও মেয়েটির ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে।

> পানঅলার কথায় সৌজন্যের কোনো অভাব ছিল না। তবু তারই মধ্যে সে জানিয়ে দিল যে, যদিও সে একজন পানঅলা, আর আমি একজন বড় সাহেব, তবু সেই প্রবল পক্ষ। মেয়েটিকে আমায় রাখতে হলো। ঘণ্টাখানেক পর একটি জিপ এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল। আমার মনে হলো, আমি একজন টাউট হয়ে গেছি।[৪৮]

মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন টাউটের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না। যারা নারী আর মুরগি পাকিস্তানি বাহিনীকে সরবরাহ করতো। মুক্তিবাহিনির অবস্থান জানিয়ে দিত। মন্টুর স্ত্রী তার একমাত্র ছেলেকে বাড়ির বাইরে বের হতে দিতে চায় না। কারণ ছেলেটির বয়স সতেরো-আঠারো বছর। এ বয়সের ছেলেকে পেলে পাকবাহিনি তুলে নিয়ে যায়। নারীদের তুলে নিলে কেউ হয়তো ফিরে আসে কিন্তু ছেলেদের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। মন্টুর স্ত্রী সুলেমানের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে আশ্রয় তো দেয়নি; এমনকি কোনো খবর পর্যন্ত নেয়নি। 'মেয়েমানুষের সকলেই যে ধরা পড়ে তা নয়। কিন্তু অনেকেই পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে আসে; কিন্তু যেই অবস্থায় গিয়েছিল সে অবস্থায় নয়।'[৪৯]

যুদ্ধের সময় এদেশের মানুষের উপর যখন নির্যাতন, পীড়ন, অঙ্গচ্ছেদ, ধর্ষণ, হত্যা, অত্যাচার, নিষ্পেষণ, জুলুম তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তখন ফরমান আলী আর টিক্কা খান ঘোষণা করে—'আমরা কেবল ইস্ট পাকিস্তানের মাটি চাই, মানুষ চাই না।'[৫০] সেই ফরমান অনুসারে

হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে পাকবাহিনী। তারা জগন্নাথ হল আর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ছাত্রদেরকে বের করে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে গণকবর দেয়। মেয়েদের হলে চড়াও হয়ে ছাত্রীদেরকেও লাঞ্ছিত করে।

উনিশশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের ঘটনাপ্রবাহ বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া জীবনবাস্তবতা, সংগ্রাম, চেতনাদীপ্ত, মুক্তিযুদ্ধের বিবিধ বিষয়, বাঙালিত্ব যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে স্বল্প পরিসরে, তা বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে অদ্বিতীয়। একদিকে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন অপরদিকে মধ্যবিত্তের খোলস পাল্টানো, সুযোগসন্ধানী, সময়ের সাথে গা ভাসিয়ে দেওয়া, নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সুরক্ষিত রাখা, কোনো কোনো স্থানে ত্যাগী হয়ে ওঠা, মানবিক গুণাবলি ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার দলিল রশীদ করীমের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *চিনি না* তে উপজীব্য বিষয় হয়েছে।

মধ্যবিত্ত না পারে মাটিতে দেবে যেতে না পারে আকাশ ছুঁতে। রশীদ করীমের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে মধ্যবর্গের দ্বিধান্বিত মানসিকতা ও দোদুল্যমানতা লক্ষ করা যায়। মধ্যবিত্ত কোন দিকে অবস্থান নিলে নিজের অবস্থান ঠিক থাকবে সেই ভাবনাই বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে। কেউ মুক্তিযুদ্ধকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে লাভবান হয়ে ওঠে। কেউ অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নারী ধর্ষণে মেতে ওঠে। কেউ যুবকদেরকে ধরিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটে। কেউ মুক্তিবাহিনীর খবর দিয়ে অট্টহাসি হাসে। কেউ দেশের জন্য প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধে নেমে পড়ে। কেউ বিপদে পড়া মানুষকে আশ্রয় দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সেবা দিয়ে সহযোগিতা করে। তাই মুক্তিযুদ্ধে মধ্যবর্গের একদিকে মানবিকতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সাহসিকতা, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ত্যাগ, বীরত্ব, অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মানুসন্ধান, সক্ষমতা, ধৈর্য অন্যদিকে মধ্যবর্গের সংকট, সন্দেহ, অবিশ্বাস, পশ্চাৎপদতা, প্রতারণা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ছলনা, স্বার্থ, বিচ্ছিন্নতা, নারী নির্যাতন, হত্যা, খুন, বিকৃত রুচি, স্খলন, পতন, জুলুম, অত্যাচার, দখল, ক্ষোভ, অবাধ যৌনতা, আত্মস্খলন, নিঃসঙ্গতা, হঠকারিতা,আত্মগ্লানি, লালসা ও অপকর্মকে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন নিখুঁতভাবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে মধ্যবিত্তের বিচিত্র রূপ প্রকাশে তিনিই প্রথম ও সার্থক ঔপন্যাসিক।

তথ্যসূচি:

---

[১] আহমদ শরীফ, *সংকট : জীবনে ও মননে* (ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৭

[২] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা: দেজ’ পাবলিশিং, ২০১৪), পৃ. ২১৫

[৩] কার্তিক লাহিড়ী, *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ. ২

[৪] গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি,

২০১৩), পৃ. ১৭
[৫] ইয়াসমিন আরা, *সমরেশ বসুর উপন্যাসে মধ্যবিত্তজীবন* (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫), পৃ. ৪৩
[৬] রামেশ্বর শ', *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৬), পৃ. ৫২
[৭] আবুল কাশেম ফজলুল হক, *সাহিত্য চিন্তা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ৫৪
[৮] শামসুর রাহমান, " রশীদ করীম : একজন বড় মাপের লেখক," অন্তর্গত, *একজন উত্তম পুরুষ: রশীদ করীম স্মারকগ্রন্থ*, হামিদ কায়সার সম্পা. (ঢাকা: জয়তী, ২০১৩), পৃ. ১৭৪
[৯] মহাদেব সাহা, "কথাশিল্পী রশীদ করীম," অন্তর্গত, হামিদ কায়সার সম্পা. (ঢাকা: কথক রশীদ করীম সংখ্যা, ২০০৪), পৃ. ৬৪
[১০] ছন্দশ্রী পাল, *বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ. ১৩৮
[১১] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি. ১৯৯৬), পৃ. ৩৪৪
[১২] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, "রশীদ করীম: তাঁর উপন্যাস ও একটি স্মৃতিগ্রন্থ," অন্তর্গত, হামিদ কায়সার সম্পা. (ঢাকা: কথক রশীদ করীম সংখ্যা, ২০০৪), পৃ. ৩৯
[১৩] রশীদ করীম রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৩৬
[১৪] কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী* (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৮), পৃ. ৪১৮
[১৫] রশীদ করীম রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৬৮
[১৬] বুলান্দ জাভীর, "রশীদ করীম-এর আমার যত গ্লানি: গহন মনোলোক," অন্তর্গত, হামিদ কায়সার সম্পা. (ঢাকা: কথক রশীদ করীম সংখ্যা, ২০০৪), পৃ. ১১৫
[১৭] রশীদ করীম রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৫৮
[১৮] ছন্দশ্রী পাল, *বাংলাদেশের উপন্যাস পরিবার ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি,২০০৯), পৃ. ১৩৮
[১৯] বিকাশ মজুমদার, *রশীদ করীম ও তাঁর উপন্যাস* (ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ১১১
[২০] রশীদ করীম রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ৪৬৫।
[২১] তদেব, পৃ. ২৫৭
[২২] সাঈদ হাসান দারা, *অপারেশন সার্চলাইট*, ২য় মুদ্রণ (ঢাকা: অন্বেষা, ২০১৫), পৃ. ১৯৮
[২৩] শাহীন আখতার, *তালাশ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪), পৃ. ২৭
[২৪] মাওলা প্রিন্স, *রশীদ করীমের উপন্যাস : বিষয়বৈভব ও শিল্পরূপ* (ময়মনসিংহ : মুক্তদুয়ার, ২০১৪), পৃ. ৬০
[২৫] সারোয়ার জাহান, *বাংলা উপন্যাসের সেকাল-একাল* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯১), পৃ. ১৪৬
[২৬] বিনয় ঘোষ, *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ১২
[২৭] বুলান্দ জাভীর, "রশীদ করীম-এর আমার যত গ্লানি: গহন মনোলোক," অন্তর্গত, হামিদ কায়সার সম্পা. (ঢাকা: কথক রশীদ করীম সংখ্যা, ২০০৪), পৃ. ১১৪
[২৮] নুরউল করীম খসরু, " রশীদ করীমের 'আমার যত গ্লানি': সতত সন্ধানের অভিযাত্রা," অন্তর্গত, একজন উত্তম পুরুষ, হামিদ কায়সার সম্পা. (ঢাকা: জয়তী, ২০১৩), পৃ. ১০০
[২৯] রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০২), পৃ. ৬২
[৩০] রশীদ করীম রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ১৯৭
[৩১] তদেব, পৃ. ১৯৬
[৩২] তদেব, পৃ. ৩০১
[৩৩] তদেব, পৃ. ৩০৪
[৩৪] হামিদ কায়সার ও পিয়াস মজিদ, *রশীদ করীমের সাক্ষাৎকারগুচ্ছ* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৮), পৃ. ৩৪
[৩৫] রশীদ করীম রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ৩০৩-৩০৪
[৩৬] পিয়াস মজিদ, *করুণ মাল্যবান ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০১২), পৃ. ৪৩

[৩৭] মাওলা প্রিন্স, *রশীদ করীমের উপন্যাস: বিষয়বৈভব ও শিল্পরূপ* (ময়মনসিংহ : মুক্তদুয়ার, ২০১৪), পৃ. ২৯
[৩৮] হামিদ কায়সার ও পিয়াস মজিদ সম্পা., *রশীদ করীমের সাক্ষাৎকারগুচ্ছ* (ঢাকা: অনন্য, ২০১৮), পৃ. ১৯
[৩৯] রশীদ করীম রচনাবলি চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২২৮
[৪০] তদেব, পৃ. ২৫২
[৪১] তদেব, পৃ. ২৩৩
[৪২] বিকাশ মজুমদার, *রশীদ করীম ও তাঁর উপন্যাস* (ঢাকা: দেশ পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ১১৫
[৪৩] রশীদ করীম রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৬৮
[৪৪] তদেব, পৃ. ২৩৪
[৪৫] মাওলা প্রিন্স, *রশীদ করীমের উপন্যাস: বিষয়বৈভব ও শিল্পরূপ* (ময়মনসিংহ : মুক্তদুয়ার, ২০১৪), পৃ. ৩০
[৪৬] রশীদ করীম রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৪২
[৪৭] রফিকউলালাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৩১৯
[৪৮] রশীদ করীম রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৩০
[৪৯] তদেব, পৃ. ২৩০
[৫০] রশীদ করীম রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০২১), পৃ. ২৫৩